OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 97 - 106
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মৃত্তিকা ও মনস্তত্ত্ব : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছলনাময়ী’ ও ‘রসকলি’ গল্পগ্রন্থে রসতত্ত্ব, মনোবিশ্লেষণ ও প্রান্তিক মানবসত্তার রূপায়ণ

সাদিয়া আফরিন
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ [ইউল্যাব]
Email ID: sadia.afrin@ulab.edu.bd
iD 0009-0007-4320-773X

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Rasa theory, psychoanalysis, scapegoat mechanism, marginal subjectivity, vatsalya rasa, the uncanny, Tarashankar Bandyopadhyay, Chhalanamayee, Rasakali.

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay's early short-story collections Chhalanamayee (1937) and Rasakali (1939) occupy a relatively underexplored position within the critical discourse on his literary oeuvre, despite their significant engagement with rural life and the psychological complexities of marginal existence. This article proposes an alternative interpretive framework by reading the two collections through the classical Indian theory of rasa, particularly vatsalya (parental affection), karuna (pathos), and bhayanaka/ raudra (terror/wrath), in dialogue with two major Western psychological paradigms: Sigmund Freud's concepts of the uncanny and repetition compulsion, and René Girard's theory of the scapegoat mechanism. Close readings of stories such as Sandhamani, Dainir Bashi, Khorga, Akhraiyer Dighi, the titular Chhalanamayee, Rasakali, and Kalapahar demonstrate that Tarashankar's rural, marginal, and even non-human characters are represented not merely as sociological types but as psychologically complex subjects whose experiences of grief, guilt, jealousy, dignity, and emotional conflict can be understood through both indigenous aesthetic principles and cross-cultural psychoanalytic perspectives. The article argues that Tarashankar's fiction anticipates, in vernacular and pre-theoretical form, insights later articulated within modern psychoanalytic and anthropological thought, revealing how collective violence frequently converges upon an arbitrary victim and how repressed trauma returns in cyclical and uncanny forms. By bringing classical Indian aesthetics into conversation with modern psychoanalytic theory, this study offers a fresh critical perspective on Tarashankar's early short fiction and demonstrates how the interplay of emotion, psychology, and social marginality deepens our understanding of human and even non-human, subjectivity within the contexts of rural poverty, superstition, and communal judgment.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১) মৃত্তিকাসংলগ্ন জনজীবনের অবিস্মরণীয় কথাকোবিদ হিসেবে স্বীকৃত। বীরভূমের রুক্ষ লাল মাটি এবং সেই মাটিতে বেঁচে থাকা কৃষক, মাঝি, বাউল, বৈষ্ণবী, খনি-শ্রমিক ও প্রান্তিক নারীর জীবন তাঁর সাহিত্যের স্থায়ী পটভূমি। তারাশঙ্করের চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব বিমূর্ত বা মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন নয়, বরং তা 'মৃত্তিকালগ্ন', অর্থাৎ রক্ত-মাংস-ঘাম-ফসলের বাস্তবতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। শোক, অপরাধবোধ, ঈর্ষা বা আত্মমর্যাদার মতো যেকোনো মানসিক অভিজ্ঞতা তারাশঙ্করের গল্পে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট মাটি, ঋতু ও জীবিকার প্রেক্ষাপটে রূপ নেয়; মনস্তত্ত্ব এখানে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নিরাসক্ত পরীক্ষাগার নয়, বরং মৃত্তিকা থেকেই উৎসারিত। তারাশঙ্করের দুই প্রাথমিক-পর্বের গল্পগ্রন্থ - 'ছলনাময়ী' (১৯৩৭) ও 'রসকলি' (১৯৩৯) এই মৃত্তিকালগ্ন মনস্তত্ত্বের এক অসাধারণ পরীক্ষাক্ষেত্র। এই দুই সংকলনে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ, প্রান্তিক নারী, এমনকি গৃহপালিত পশু পর্যন্ত এমন এক মনোজগতের অধিকারী হয়ে ওঠে, যাকে নিছক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত বলে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাছাড়া তারাশঙ্করের আবির্ভাবকালও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে যখন ঔপনিবেশিক শাসনের চাপে গ্রামবাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ছিল, মহাজনী শোষণ ও জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয় তীব্র হচ্ছিল, তখনই তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু করেন। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ভাঙন; এই সমস্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমি হয়ে উঠেছে। 'ছলনাময়ী' ও 'রসকলি' রচিত হয় ঠিক এই সন্ধিক্ষণে, যখন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এক গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে এই দুই গল্পগ্রন্থের চরিত্রদের মানবসত্তার সংকট নিছক ব্যক্তিগত সংকট নয়; তা যুগ-সন্ধিক্ষণের সামাজিক সংকটেরও প্রতিফলন। এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য তিনটি সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, *ছলনাময়ী* ও *রসকলি* সংকলনের গল্পগুলিতে মানব-মনোজগতের যে জটিলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা ভারতীয় রসতত্ত্বের বাৎসল্য, করুণ ও ভয়ানক রসের সংমিশ্রণে যেমন পাঠযোগ্য, তেমনি তা ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ ও রেনে জিরার্ডের নৃতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকেও সমান দক্ষতায় ব্যাখ্যাযোগ্য; অর্থাৎ তারাশঙ্করের অন্তর্দৃষ্টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় তাত্ত্বিক পরিভাষাতেই সমানভাবে বৈধ প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা কেবল মানব চরিত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না; 'কালাপাহাড়' গল্পের মতো দৃষ্টান্তে তারাশঙ্কর অ-মানব প্রাণীর অভ্যন্তরীণ শোক ও আসক্তিকেও পূর্ণ মর্যাদায় চিত্রিত করেছেন। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা; মায়ের শোক, সমাজের বলিদান-প্রবণতা, অপরাধবোধের প্রত্যাবর্তন, প্রেমিকার আত্মমর্যাদা, সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট মৃত্তিকা-সংলগ্ন বাস্তবতার মধ্যে ঘটে, যা তারাশঙ্করের মনস্তত্ত্ব-চিত্রণকে বিমূর্ত মনোবিজ্ঞান থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র, ভূমিজ মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদে পরিণত করে।

তারাশঙ্করের গল্পে মানবমনস্তত্ত্বের গভীরতা বিশ্লেষণের জন্য এই প্রবন্ধে তিনটি পরস্পর-সম্পৃক্ত তাত্ত্বিক অবলম্বন গ্রহণ করেছে; ভারতীয় রসতত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ এবং রেনে জিরার্ডের 'স্কেপগোট মেকানিজম' বা বলিভুক তত্ত্ব। এই তিনটি তত্ত্ব একে অপরের বিকল্প নয়, বরং পরিপূরক একটি প্রাচ্য নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টি, একটি পাশ্চাত্য গভীর-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি, এবং একটি নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক দৃষ্টি একত্রে তারাশঙ্করের গল্পের বহুস্তরীয় মানবসত্তাকে ধরার চেষ্টা করে।

রসতত্ত্ব : বাৎসল্য, করুণ ও ভয়ানক রস— ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রসতত্ত্ব অনুসারে, সাহিত্যকর্মে স্থায়ীভাব- বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাবের সংযোগে রসে রূপান্তরিত হয়। 'ছলনাময়ী' গ্রন্থের ভূমিকাংশেই লক্ষণীয় যে, এর তিনটি গল্প - 'সন্ধ্যামণি', 'ডাইনীর বাঁশি', 'মেলা' - এর প্রধান সুর বাৎসল্য রস, অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যকার স্নেহাত্মক সম্পর্কের নন্দনতাত্ত্বিক রূপায়ণ।[১] বাৎসল্য রস ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রে নয়টি মূল রসের অন্তর্ভুক্ত না হলেও পরবর্তী আলংকারিকরা, বিশেষত রূপ গোস্বামী, একে একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ রস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তারাশঙ্করের গল্পে বাৎসল্য রস কেবল মধুর পারিবারিক আবহ সৃষ্টি করে না; বরং তা প্রায়ই করুণ রস ও ভয়ানক/ রৌদ্র রসের সঙ্গে জটিলভাবে সংমিশ্রিত হয়ে এক ট্র্যাজিক গভীরতা অর্জন করে। এই রস-সংমিশ্রণের কৌশলগত ব্যবহারই তারাশঙ্করের গল্পের মানসিক জটিলতার নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তি।

ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ : অচেতন, Uncanny ও repetition compulsion— সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Uncanny' (Das Unheimliche, ১৯১৯)-এ দেখিয়েছেন যে, যা একদা পরিচিত ও ঘরোয়া ছিল, তা দমিত হয়ে অবচেতনে চলে গেলে পরবর্তীতে অপরিচিত ও ভীতিকর রূপে ফিরে আসে; এই প্রত্যাবর্তনই 'আনক্যানি' বা গা-ছমছমে অনুভূতির উৎস।[২] এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেকটি ধারণা 'repetition compulsion' বা পুনরাবৃত্তি-বাধ্যতা, যেখানে দমিত আঘাত বা অপরাধবোধ বারবার নতুন রূপে ফিরে আসতে থাকে যতক্ষণ না তা সচেতনভাবে মোকাবিলা করা হয়। তারাশঙ্করের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি বিশেষত 'খড়্গ' ও 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে এই ফ্রয়েডীয় কাঠামোর সঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে পূর্বজন্মের বা অতীতের অপরাধবোধ চরিত্রদের বর্তমান জীবনে অতিপ্রাকৃত রূপে ফিরে আসে।

রেনে জিরার্ডের স্কেপগোট মেকানিজম : নৃবিজ্ঞানী ও সাহিত্যতাত্ত্বিক রেনে জিরার্ড তাঁর Violence and the Sacred (১৯৭২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সামাজিক সংকট বা অস্থিরতার মুহূর্তে সম্প্রদায় প্রায়ই একজন নিরপরাধ, প্রান্তিক ব্যক্তিকে 'বলিপ্রদত্ত ছাগ' বা স্কেপগোট হিসেবে চিহ্নিত করে তার ওপর সামষ্টিক ক্ষোভ ও ভীতি নিক্ষেপ করে, যার ফলে সাময়িকভাবে সামাজিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] এই তত্ত্ব তারাশঙ্করের 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পের পাঠে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যেখানে একজন নিরপরাধ নারীকে সমাজ 'ডাইনি' অপবাদে চিহ্নিত করে তার জীবন ধ্বংস করে দেয়, নিছক একটি কাকতালীয় ঘটনার ভিত্তিতে।

ছলনাময়ী গ্রন্থের তিনটি গল্প - 'সন্ধ্যামণি', 'ডাইনীর বাঁশি', 'মেলা', বাৎসল্য রসের নিরিখে পাঠ করলে দেখা যায়, তারাশঙ্কর মাতৃ-সন্তান সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে তিনটি ভিন্ন কৌণিক থেকে অন্বেষণ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, শোক ও ভুল বোঝাবুঝির মনস্তত্ত্ব, সামাজিক অপবাদের বলিদান, এবং সামাজিক প্রান্তিকতার মধ্যেও মাতৃহৃদয়ের অক্ষয়তা। 'সন্ধ্যামণি' গল্পে কন্যার মৃত্যুতে মা কুসুম পাষাণসম হয়ে যায়, আর তা ভুল বুঝে কেনারাম চাটুজ্জে গৃহত্যাগ করেন, কারণ তাঁর মনে হয় মেয়ের মৃত্যুতে কুসুমের মনে কোনো প্রভাব পড়েনি। এই ভুল বোঝাবুঝির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ তীব্র শোক প্রায়ই বাহ্যিক অসাড়তা বা 'emotional numbing'-এর রূপ নেয়, যা আধুনিক শোক-মনস্তত্ত্বেও (grief psychology) সুপরিচিত একটি প্রপঞ্চ। কুসুমের অন্তরের হাহাকার তার বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ না পাওয়াই কেনারামের ভুল বোঝাবুঝির কারণ। গল্পের শেষে কুসুমের উক্তিতে এক আশাবাদী পুনর্গঠন লক্ষণীয় -

> "...সে আমার—সে আমার ছাড়া আর কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই কথা, সেই সব।"[৪]

এই উক্তি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একধরনের 'অস্বীকার' (denial) নয়, বরং শোক-প্রক্রিয়ার একটি সৃজনশীল পর্যায়; যা প্রিয়জনের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় রূপান্তরিত করার এক আত্মরক্ষামূলক কৌশল। বাৎসল্য রসের সঙ্গে করুণ রসের এই সংমিশ্রণ কুসুম চরিত্রকে নিছক শোকার্ত মা নয়, বরং এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তায় পরিণত করে। গল্পটির গঠনরীতি লক্ষ করলে দেখা যায়, তারাশঙ্কর এখানে দুটি সমান্তরাল শোক-প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেছেন; কেনারামের দৃশ্যমান, প্রকাশ্য শোক এবং কুসুমের অদৃশ্য, অন্তর্গত শোক। দুই ধরনের শোক-প্রকাশের এই সাংঘর্ষিক উপস্থাপনা প্রমাণ করে যে তারাশঙ্কর শোকের সামাজিক প্রকাশরীতি (grief display rules) সম্পর্কে সূক্ষ্ম সচেতন ছিলেন। একজন পুরুষের শোক যেখানে প্রকাশ্য ক্রোধ বা গৃহত্যাগের রূপ নেয়, সেখানে একজন মায়ের শোক অন্তর্মুখী স্তব্ধতার রূপ নেয়, যা সমাজের চোখে সহজেই 'নিরাসক্তি' বলে ভুল বিবেচিত হতে পারে। এই ভুল বিচারের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর সমাজের শোক সম্পর্কে সরলীকৃত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং কুসুমের অন্তর্গত যন্ত্রণাকে গল্পের প্রকৃত নৈতিক কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন।

'ডাইনীর বাঁশি' গল্পে প্রধান চরিত্র স্বর্ণকে ও তার মাকে সমাজ 'ডাইনি' অপবাদে চিহ্নিত করার পর, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বর্ণের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়। মুখুয্যে বাড়ির বউ গর্ভবতী হওয়ার খবর সবার আগে স্বর্ণ জেনে যাওয়ায় গ্রামের সবাই তাকে ডাইনি বলে অভিহিত করে। এই আখ্যানভঙ্গি জিরার্ডের স্কেপগোট তত্ত্বের প্রায় নিখুঁত সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত। জিরার্ডের তত্ত্ব অনুসারে, বলির পাত্র নির্বাচনের যুক্তি প্রায়শই সম্পূর্ণ কাকতালীয় বা ভিত্তিহীন হয়; গুরুত্বপূর্ণ হল

নির্বাচিত ব্যক্তির প্রান্তিকতা, তার সমাজে ইতিমধ্যে-বিদ্যমান দুর্বল অবস্থান, যা তাকে 'যোগ্য' বলি করে তোলে। স্বর্ণ ইতোমধ্যেই 'ডাইনির মেয়ে' বলে চিহ্নিত হওয়ায় সমাজের সন্দেহ-প্রক্ষেপণের স্বাভাবিক লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। গল্পের গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক স্তরটি প্রকাশ পায় স্বর্ণ ও টুকুর সম্পর্কের বিবরণে। টুকু, মুখুয্যে বাড়ির শিশু, স্বর্ণকে অপরিসীম ভালোবাসে, আর সেই ভালোবাসাই তাকে গ্রামীণ কুসংস্কারের হাত থেকে সাময়িক আশ্রয় দেয়। কিন্তু গ্রামের ক্রমবর্ধমান অবদমনের চাপে টুকুর পরিবারও তাকে স্বর্ণর থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, যা জিরার্ডের তত্ত্বেরই একটি সম্প্রসারিত রূপ প্রকাশ করে। বলিপ্রদত্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যে-কেউ, এমনকি নিষ্পাপ শিশুও, সামাজিক শুদ্ধিকরণ-প্রক্রিয়ার আওতায় বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়। এইভাবে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন যে সামাজিক অপবাদ কেবল ব্যক্তিকে নয়, তার চারপাশের স্নেহ সম্পর্কের গোটা জালকেই ছিন্নভিন্ন করে দেয়; যা স্কেপগোটিং-এর একটি কম আলোচিত কিন্তু গভীর সামাজিক পরিণাম।

গল্পের করুণ পরিণতিতে দেখা যায়, স্বর্ণ এই ডাইনি প্রচারের জন্য তার প্রিয় টুকুকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যার ফলে ছোট টুকু অসুস্থ হয়ে পড়লে, গ্রামের মানুষরা তাকে আরো বেশি অবদমন করে। টুকুকে স্বর্ণ একটি বাঁশি দিয়েছিল, সেই বাঁশি নিয়ে টুকু স্বর্ণের কাছে আসলে স্বর্ণ আর দরজা খোলে না।

> "স্বর্ণ বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর দুয়ারের ওপাশে বাঁশীটা পথে পথে বাজাতে বাজাতে দূরে চলিয়া গেল।"[৫]

বিধবা স্বর্ণের জীবনের একমাত্র অবলম্বন মাতৃস্নেহ ছিল তাও গ্রামীণ জীবনের সংস্কারের কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। গল্পে বাঁশির সুর, যা এতক্ষণ স্বর্ণ ও তার সন্তানসম টুকুর সংযোগের প্রতীক ছিল; এখন দূরে সরে যাওয়ার শব্দ হয়ে ওঠে, যা সামাজিক বলিদানের চূড়ান্ত মুহূর্তে ব্যক্তির সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শ্রুতিগত প্রতীক। জিরার্ড দেখিয়েছেন যে বলিপ্রদত্ত ব্যক্তিকে সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত বা নিঃসঙ্গ করে দেওয়াই স্কেপগোট মেকানিজমের চূড়ান্ত পরিণতি; তারাশঙ্কর এই প্রক্রিয়াকে বাঁশির শব্দ ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার আকারে দৃশ্যায়িত করেছেন, যা নিছক করুণ রস নয়, বরং একটি সামাজিক সহিংসতার নন্দনতাত্ত্বিক দলিল।

'মেলা' গল্পে একজন পতিতা নারীর ভেতরকার মাতৃ-হৃদয়ের প্রবল বাসনা, মানব মনস্তত্ত্বের চিরন্তন রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে যাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই, কিন্তু তাদের ভেতরকার হৃদয়স্পর্শী স্থানটিকে লেখক এই গল্পে তুলে এনেছেন। রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত সাহসী একটি পরীক্ষা। বাৎসল্য রস, যা ধ্রুপদী কাব্যশাস্ত্রে সাধারণত গৃহবধূ বা রাজরানির প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হত, তারাশঙ্কর তাকে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও নিন্দিত নারীর অন্তর্গত অনুভূতি হিসেবে স্থাপন করেছেন। এই স্থানান্তর রসতত্ত্বের গণতান্ত্রিকীকরণ বলা যেতে পারে, যা উচ্চবর্গীয় নন্দনতাত্ত্বিক আবেগকে প্রান্তিক মানবসত্তার অধিকারে পরিণত করা।

'সন্ধ্যামণি', 'ডাইনীর বাঁশি' ও 'মেলা' — এই তিনটি গল্প একসঙ্গে পাঠ করলে একটি সংগতিপূর্ণ প্যাটার্ন দৃশ্যমান হয়। প্রতিটি গল্পেই মাতৃত্ব বা মাতৃসদৃশ স্নেহ এক সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়, যা মৃত্যু, কুসংস্কার, কিংবা সামাজিক নিন্দা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই স্নেহ প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এক অবিনশ্বর রূপে টিকে থাকে। এই পুনরাবৃত্ত কাঠামো প্রমাণ করে যে *ছলনাময়ী* সংকলনে বাৎসল্য রসের ব্যবহার আকস্মিক নয়, বরং একটি সচেতন শিল্পভাবনার অংশ; তারাশঙ্কর যেন বলতে চেয়েছেন, সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক, মাতৃহৃদয়ের সত্যতা তার দ্বারা মাপা যায় না।

ছলনাময়ী গ্রন্থের আরও তিনটি গল্প — 'খড়গ', 'আখড়াইয়ের দীঘি', এবং নামগল্প 'ছলনাময়ী' - যা অতিপ্রাকৃত উপাদানের মধ্য দিয়ে মানব-মনস্তত্ত্বের অবচেতন স্তরকে উন্মোচন করে। এই তিনটি গল্পই ফ্রয়েডীয় 'uncanny' ধারণার আলোকে বিশেষভাবে পাঠযোগ্য, কারণ এখানে অতীতের দমিত অপরাধ বা সহিংসতা বর্তমানে অতিপ্রাকৃত রূপে প্রত্যাবর্তন করে।

'খড়গ' গল্পে উত্তম পুরুষ ঘুমের মধ্যে পূর্বজন্মের স্মৃতিচারণা করে। যেখানে রাজাবাবুদের বলিদানের সময় একত্রিত না হওয়ায় ভয়াবহ অপরাধে তাদের সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল, এই গ্লানিবোধ থেকে সে আগের জন্মে আত্মহত্যা করে, আর সেই খড়গটিকে পুকুরের পাশে মাটিচাপা দিয়েছিল। ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিতে এই আখ্যান পুনরাবৃত্তি-বাধ্যতার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(repetition compulsion) এক সুস্পষ্ট রূপক, যেখানে দমিত অপরাধবোধ পুনর্জন্মের আকারে হলেও নিজেকে পুনরাবৃত্ত করতে থাকে, যতক্ষণ না চরিত্র সচেতনভাবে তার নৈতিক অবস্থান থেকে হিংসা প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করে—

> "তোকেও যে বড় হয়ে বলিদান করতে হবে। এ যে আমাদের বৃত্তি। আমি বলিতাম— কক্ষনো না— কক্ষনো, আমি বলিদান করব না।"[৬]

এই দ্বৈরথ যা বংশানুক্রমিক হিংসার 'বৃত্তি' বনাম ব্যক্তির নৈতিক প্রত্যাখ্যান; কিংবা আসলে তা অবচেতনের সঙ্গে চেতনার সংগ্রাম, যেখানে পুনর্জন্মের অতিপ্রাকৃত কাঠামো মনস্তাত্ত্বিক গ্লানি-নিরসনের একটি সাংস্কৃতিক ভাষ্য হিসেবে কাজ করে। রসতাত্ত্বিক দিক থেকে এখানে ভয়ানক রস ও করুণ রসের মিশ্রণ ঘটেছে, যা হিংসার ভয়াবহতা এবং অনুশোচনার বেদনা একই সঙ্গে সক্রিয়।

লক্ষণীয় যে, তারাশঙ্কর এখানে পুনর্জন্মকে নিছক লোকবিশ্বাসের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং তা এক মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে বংশগত বা সামষ্টিক হিংসার দায় ব্যক্তি-চরিত্রের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে পুনরায় অভিজ্ঞতাযোগ্য হয়ে ওঠে। ফ্রয়েডের ভাষায় বলা যায়, স্বপ্ন এখানে 'royal road to the unconscious'-এর ভূমিকা পালন করছে। জাগ্রত অবস্থায় যে নৈতিক সিদ্ধান্ত ('আমি বলিদান করব না') ব্যক্তি নিতে পারে, তার পূর্বশর্ত হিসেবে স্বপ্নে অতীত হিংসার সম্পূর্ণ পুনর্জীবন প্রয়োজন হয়। এইভাবে গল্পটি প্রমাণ করে যে নৈতিক প্রত্যাখ্যান কোনো বিমূর্ত সিদ্ধান্ত নয়, বরং তা অবচেতনের গভীরতম স্তরের সঙ্গে সংযুক্ত একটি অভিজ্ঞতাগত প্রক্রিয়া।

'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পে দস্যুবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে কালীচরণ তার নিজের পুত্র তারাচরণকে হত্যা করে এবং পরে আখড়াইয়ের দীঘিতে তাকে দাহ করে। স্বজ্ঞানে ফেরার পর সে প্রতিদিন দীঘির পাড়ে পুত্রকে খুঁজতে আসে এবং নিয়তির চরম বিপর্যয়ে তার নিজেরও অসহায় মৃত্যু ঘটে সেই একই স্থানে। এই কাঠামোটি ফ্রয়েডের 'uncanny'-এর ধ্রুপদী সংজ্ঞার সঙ্গে হুবহু মেলে: যা একদা অতি ঘরোয়া ও পরিচিত ছিল (পিতা-পুত্রের স্নেহসম্পর্ক, নিজস্ব দীঘি) তাই ভয়াবহ অপরাধের স্মৃতিবাহী হয়ে অপরিচিত ও ভীতিকর হয়ে ফিরে আসে। গল্পের সমাপ্তিতে সমাজের করুণাসিক্ত রায়—

> "দেহটি আর মর্গে পাঠাবেন না। এই আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।"[৭]

এই উক্তিতে সমাজ অপরাধী কালীচরণের প্রতি এক অদ্ভুত ক্ষমাসুলভ করুণা প্রদর্শন করে, যা প্রমাণ করে তারাশঙ্কর অপরাধকেও সম্পূর্ণ মানবেতর করে দেখাননি; বরং অপরাধী নিজেও গভীরতম মানসিক যন্ত্রণার শিকার এবং তার মৃত্যুই তার একমাত্র মুক্তি। এইখানে করুণ রস তার চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত, যেখানে অপরাধ ও ক্ষমা একই আবেগীয় পরিসরে সহাবস্থান করে।

এই গল্পের কাঠামোগত পুনরাবৃত্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কালীচরণ প্রতিদিন সেই একই দীঘির পাড়ে ফিরে আসে, যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে বারবার অপরাধস্থলে টেনে আনে। ফ্রয়েডের repetition compulsion তত্ত্ব অনুসারে, এই বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তন কোনো যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নয়, বরং অচেতন মনের এক প্রয়াস, যা আঘাতকে পুনরায় অভিজ্ঞতা করে তাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা, যা কখনও সম্পূর্ণ সফল হয় না। তারাশঙ্কর এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে স্থানিক প্রতীকে (দীঘি) রূপান্তরিত করে দেখিয়েছেন যে, ভৌগোলিক স্থান কীভাবে মানুষের অবচেতন স্মৃতির ধারক হয়ে ওঠে। একটি দীঘি নিছক জলাশয় থেকে অপরাধ ও গ্লানির স্থায়ী সাক্ষীতে রূপান্তরিত হয়, যা মৃত্তিকা ও মনের মধ্যকার সেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কেরই আরেকটি দৃষ্টান্ত, যা এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি।

নামগল্প 'ছলনাময়ী'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র কয়লাখনির ম্যানেজার এক তান্ত্রিক সাধক, যার সাধনার লক্ষ্য তন্ত্রের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন। এই সাধনার জন্য শবদেহের প্রয়োজন হওয়ায় সে ইচ্ছাকৃতভাবে কম্পাস কানাইকে হত্যা করায়, অথচ কানাই তার কন্যার স্বামী। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে মেয়েকে বিধবা করতে সে পিছপা হয়নি। তবে গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন তার মেয়েটির আর্তনাদ শোনে, তখন তার মধ্যে এক আকস্মিক মানসিক ভাঙন ঘটে—

> "দূরে অন্ধকারের বুক চিরিয়া শব্দ আসিল— আঃ—হি, হি, হি। আঃ—আঃ।"[৮]

এবং শেষে তার নিজের স্বীকারোক্তি—

> "অতি যন্ত্রণায় সম্বিত ফিরে আসে— তাই। মানুষ তো আমি, অমিয়বাবু।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই দ্বিধাবিভক্ত সত্তা, যা একদিকে ক্ষমতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির লোভে অন্ধ তান্ত্রিক, অন্যদিকে যন্ত্রণায় সম্বিত ফিরে পাওয়া মানুষ; যাকে ফ্রয়েডের 'id' ও 'superego'-র দ্বন্দ্বের এক সাহিত্যিক রূপক হিসেবে পাঠ করা যায়। তান্ত্রিক শক্তির সাধনা এখানে অবদমিত লোভ ও হিংসার (id) প্রতীক, আর 'মানুষ তো আমি' উক্তিটি বিবেকের (superego) চূড়ান্ত জয় ঘোষণা। এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈরথ গল্পটিকে নিছক ভৌতিক আখ্যান থেকে এক গভীর নৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় রূপান্তরিত করে।

গল্পের শিরোনাম 'ছলনাময়ী' — এই প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ছলনা এখানে কোনো নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয় (যেমনটি শিরোনাম প্রথম দর্শনে ইঙ্গিত করতে পারে), বরং তা ক্ষমতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির নিজস্ব প্রতারণা; যে সাধনা মানুষকে সর্বশক্তিমান করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তা আসলে তাকে তার নিজস্ব মনুষ্যত্ব থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই অর্থে 'ছলনাময়ী' নামগল্পটি সমগ্র সংকলনের একটি রূপক-কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে— সমাজ, কুসংস্কার, ক্ষমতা, প্রতিটি বহিঃস্থ শক্তিই মানুষকে তার প্রকৃত আত্মপরিচয় থেকে বিচ্যুত করার 'ছলনা' রচনা করে, আর তারাশঙ্করের চরিত্রদের সংগ্রাম সেই ছলনা ভেদ করে নিজের 'মানুষ' পরিচয়ে প্রত্যাবর্তনের সংগ্রাম।

রসকলি গ্রন্থের গল্পগুলিতে মানবমনের বিচিত্র সংশয়, দ্বন্দ্ব ও বিবাদ আরও বিস্তৃত সামাজিক পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে প্রেম-ঈর্ষার ত্রিভুজ, প্রাণির মধ্যে আরোপিত মানব মনস্তত্ত্ব, লোভ-বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব এবং চারিত্রিক আসক্তির মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

নামগল্প 'রসকলি' বৈষ্ণব সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও তা কোনো বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব বা দর্শনের গল্প নয়; বরং তা বাস্তব ও চিরন্তন নর-নারীর প্রেমের কথাই প্রতিষ্ঠা করে। পুলিনচন্দ্র, মঞ্জুরী, রামদাস ও গোপিনী - এই চার চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনি রূপান্তরিত হয়। পুলিন মঞ্জুরীকে ভালোবাসে, কিন্তু পুলিনের পিতা রামদাস মঞ্জুরীর উচ্ছল বর্ণচ্ছটাকে পছন্দ করেন না বলে গোপিনীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দেন। এই পারিবারিক ক্ষমতা-কাঠামোর বিরুদ্ধে মঞ্জুরীর প্রতিক্রিয়া আত্মবিসর্জন নয়, বরং আত্মমর্যাদার এক দৃপ্ত ঘোষণা—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো, আমি গরবিনী।"[১০]

রসতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই পঙ্‌ক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; সামাজিক কলঙ্ককে (যা করুণ রসের উপাদান হওয়ার কথা) মঞ্জুরী শৃঙ্গার রসের আত্মগৌরবে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একধরনের 'reframing' বা পুনর্বয়ান কৌশল, যেখানে সামাজিক লাঞ্ছনাকে ব্যক্তি নিজের পরিচয়ের গর্বে পরিণত করে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে। তারাশঙ্করের নারী চরিত্র তাই এখানে নিছক ভুক্তভোগী নয়, বরং সক্রিয় মনস্তাত্ত্বিক এজেন্সির অধিকারী।

লক্ষণীয় যে, মঞ্জুরীর এই আত্মঘোষণা রাধা-কৃষ্ণ লীলার পৌরাণিক আখ্যানকে সচেতনভাবে আহ্বান করে- 'কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী' শব্দবন্ধটি সরাসরি রাধার সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে মঞ্জুরীর নিজের অবস্থানকে সমান্তরাল করে তোলে। এই আন্তঃপাঠ্যতা (intertextuality) প্রমাণ করে যে, তারাশঙ্কর মঞ্জুরীর আত্মমর্যাদাকে নিছক ব্যক্তিগত সাহস হিসেবে নয়, বরং একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক-পৌরাণিক ঐতিহ্যের সচেতন উত্তরাধিকার হিসেবে নির্মাণ করেছেন। রামদাসের পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা যখন মঞ্জুরীকে সামাজিকভাবে প্রান্তিক করে, তখন সে সেই একই সংস্কৃতির অন্তর্গত ভক্তি-প্রেমের ঐতিহ্য থেকে নিজের প্রতিরোধের ভাষা ধার করে। আর এইভাবে ক্ষমতা ও প্রতিরোধ একই সাংস্কৃতিক উৎস থেকে জন্ম নেয়, যা গল্পটিকে অতিরিক্ত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দেয়।

'কালাপাহাড়' গল্পটি তারাশঙ্করের অ-মানব চরিত্র নির্মাণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রংলাল নামে এক চাষি প্রতিবেশীদের কাছে নিজের গরুর আভিজাত্য প্রমাণ করতে দুটি বিশালকায় মহিষ কেনে, যাদের নাম দেয় কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ। একটি মহিষ বাঘের আক্রমণে মারা গেলে, নিঃসঙ্গ কালাপাহাড় ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও একা হয়ে ওঠে, এবং প্রভু ছাড়া অন্য কাউকে সহ্য করতে পারে না। এই আখ্যান আধুনিক প্রাণিসত্তা-অধ্যয়ন (animal studies) ও posthumanist তত্ত্বের আলোকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যা মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও শোক, আসক্তি ও আঘাতজনিত আচরণ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা স্বীকার করে। তারাশঙ্কর এই বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিকে পূর্বাভাসিত করেছেন তাঁর সহজাত সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। গল্পের করুণ সমাপ্তিতে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "কালাপাহাড় কিছু বুঝিল না, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন নিদারুণ যন্ত্রণা— মুহূর্তের জন্য। তারপর সে টলিতে টলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।"[১১]

এই বাক্যে 'কিছু বুঝিল না' এবং 'নিদারুণ যন্ত্রণা'-র সহাবস্থান লক্ষণীয়। প্রাণিটির জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা তার আবেগীয় যন্ত্রণাকে খর্ব করে না। এইভাবে তারাশঙ্কর মানব ও অমানবের মধ্যকার প্রচলিত সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে দেন এবং ভয়ানক-করুণ রসের এক অভাবনীয় সংমিশ্রণ ঘটান, যেখানে পাঠকের সহানুভূতি একটি অ-মানব সত্তার প্রতি প্রসারিত হতে বাধ্য হয়।

গল্পের আখ্যানভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তারাশঙ্কর কালাপাহাড়ের আচরণ-পরিবর্তনকে ধাপে ধাপে বর্ণনা করেছেন— প্রথমে সহচরের মৃত্যুতে হতবিহ্বলতা, তারপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মকতা, এবং শেষে সম্পূর্ণ প্রভু-নির্ভরতা, যেখানে সে নতুন মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে বারবার রংলালের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এই আচরণ-ধারা আধুনিক সংযুক্তি তত্ত্বের (attachment theory) সঙ্গে বিস্ময়কর মিল রাখে, যেখানে সহচর হারানোর পর একটি সামাজিক প্রাণি তীব্র সংযুক্তি-উদ্বেগ (attachment anxiety) প্রদর্শন করে এবং একটিমাত্র নিরাপদ সম্পর্কের প্রতি প্রবলভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারাশঙ্কর কোনো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার না করেই এই আচরণিক সত্যকে আখ্যানের মাধ্যমে ধরে ফেলেছেন, যা তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। গল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপটও তাৎপর্যপূর্ণ— রংলালের প্রতিবেশীদের কাছে আভিজাত্য প্রমাণের বাসনাই কালাপাহাড়ের বিয়োগান্তক নিয়তির সূচনা করে, ফলে এই গল্পটি মানুষের সামাজিক লোভ কীভাবে নির্দোষ প্রাণিজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে, তারও এক নীরব সমালোচনা।

'শ্মশান বৈরাগ্য' গল্পে মহাজন মহিম বাঁড়ুজ্জে দিদির মৃত্যুতে আকস্মিক বৈরাগ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু পরে অর্থের জন্য তাঁর মনে গভীর অনুশোচনা জন্মায়—

> "বাঁড়ুজ্জে কহিল, ঘাড়ে ভূত চেপেছিল আমার, অনর্থক এই পাঁচ-পাঁচশো টাকা—"[১২]

এই স্বীকারোক্তি মানব চরিত্রের এক বিপরীতধর্মী মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে প্রকাশ করে; যেখানে ক্ষণিক আবেগীয় উদারতা এবং তারপর তার জন্য দীর্ঘস্থায়ী মর্মযন্ত্রণা একই ব্যক্তির মধ্যে সহাবস্থান করতে পারে। অনুরূপভাবে 'অগ্রদানী' গল্পে লোভী পুরোহিত পূর্ণচক্রবর্তী শেষপর্যন্ত নিজের পুত্রের শ্রাদ্ধ-পিণ্ড নিজেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; যেখানে এক ভয়াবহ পরিহাসের মধ্য দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুরতম নিয়তি প্রকাশিত হয়—

> "দানের দিন, গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল, 'খাও হে চক্রবর্তী!'"[১৩]

এই দুটি গল্পেই লোভ একটি চরিত্রগত 'ব্যাধি' হিসেবে চিত্রিত, যা যুক্তি বা আত্মসম্মানবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। রসতাত্ত্বিক দিক থেকে এই গল্পগুলিতে বীভৎস রস ও হাস্য রসের একধরনের তিক্ত সহাবস্থান লক্ষণীয়, যেখানে পাঠকের প্রতিক্রিয়া করুণা ও বিতৃষ্ণার মিশ্রণ।

'অগ্রদানী' গল্পের নিয়তি-নির্মাণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে জিরার্ডীয় দৃষ্টিতে একটি বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া ঘটে। পূর্ণ চক্রবর্তী নিজেই তার লোভের কারণে সমাজের কাছে একপ্রকার হাস্যাস্পদ 'বলি'তে পরিণত হয়, কিন্তু এবার বলিদানকারী কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং নিয়তি নিজেই। পুত্রের পিণ্ড নিজে গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়া এক প্রতীকী শাস্তি, যেখানে চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা (খাদ্যলোভ) তাকেই সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। এই কাব্যিক ন্যায়বিচার (poetic justice) তারাশঙ্করের নৈতিক জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কারণ শাস্তি বহিরাগত নয়, বরং চরিত্রের নিজস্ব প্রকৃতি থেকেই জৈবিকভাবে উদ্ভূত, যা গল্পগুলিকে নিছক নৈতিক উপদেশ থেকে পৃথক করে মনস্তাত্ত্বিক অনিবার্যতার আখ্যানে রূপান্তরিত করে।

'ব্যাধি' গল্পে হারান আচার্য প্রয়োজন ছাড়াই চুরি করে, যা তার মনোবিকার-জাত একপ্রকার আচরণগত 'ব্যাধি', আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে kleptomania-র সঙ্গে তুলনা করা যায়। মৃত্যুশয্যায় তার সঞ্চিত ধন খুঁজে না পেয়ে মনোহর বাবুর প্রতিক্রিয়া—

> "গোটা ঘরখানা খুঁজিয়া, দেওয়াল ভাঙিয়াও কিছু না পাইয়া মনোহর বাবু একটি সকরুণ হাসি হাসিলেন। সে ধনটা কিন্তু ছিল— ছিল অদূরে নিবিড় একটা জঙ্গলের মধ্যে।"[১৪]

আর 'মুসাফিরখানা' গল্পে কথকের মন একটি ভুল অনুমানে স্থির হয়ে যায়, যেখানে নতুন দেখা বিধবা অমলাকে সে ভুলবশত তার প্রথম প্রেম কুন্দরাণী বলে ভাবতে থাকে—

> "মিথ্যা অনুমান, কিন্তু তবু মন হইল, ওই কুন্দরাণী।"[১৫]

এই দুটি গল্পই মানুষের অবচেতন কল্পনা কীভাবে বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপলব্ধি করায়, তার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত। ফ্রয়েডের 'wish-fulfillment' বা কামনা-পূরণ তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, কথকের মন বাস্তব তথ্যকে অগ্রাহ্য করে এক দমিত আকাঙ্ক্ষাকে বর্তমানে প্রক্ষেপণ করছে, যা তারাশঙ্করের গভীর মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার প্রমাণ।

অন্যদিকে, 'ব্যাধি' গল্পের হারান আচার্যের চরিত্রটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তারাশঙ্কর তার আচরণের জন্য কোনো সরল সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেননি। হারান দরিদ্র ছিল না, তবু চুরি করত। এই ব্যাখ্যাহীনতাই গল্পটিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চরিত্রগত ব্যাধি (personality disorder) ধারণার নিকটবর্তী করে তোলে, যেখানে আচরণের উৎস বাহ্যিক প্রয়োজন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক গঠন। মৃত্যুর পরেও তার সঞ্চিত ধন জঙ্গলে অরক্ষিত পড়ে থাকা, যা কখনও ব্যবহৃত হল না, আর এটি প্রমাণ করে যে হারানের চুরি অর্থনৈতিক প্রয়োজন থেকে নয়, বরং সংগ্রহ ও দখলের এক আসক্তিমূলক তাড়না থেকে উৎসারিত ছিল, যা তার মৃত্যুর পরেও অর্থহীন হয়েই থেকে যায়। এই অর্থহীনতাই গল্পের করুণ রসের প্রকৃত উৎস; যেখানে একটি সমগ্র জীবন ব্যয়িত হল এমন এক আসক্তির পেছনে, যার কোনো চূড়ান্ত তৃপ্তি ছিল না।

রসতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য মনোবিশ্লেষণের এই সংশ্লেষিত পাঠ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়, তারাশঙ্কর যে মানসিক জটিলতাকে তাঁর গল্পে ধারণ করেছেন, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় তাত্ত্বিক কাঠামোতেই সমান দক্ষতায় পাঠযোগ্য, কারণ তা মূলত সর্বজনীন মানব অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ। রসতত্ত্ব আমাদের বলে দেয় গল্পগুলির নন্দনতাত্ত্বিক গঠন ও আবেগীয় লক্ষ্য কী; আর ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ আমাদের বলে দেয় সেই আবেগের অবচেতন উৎস কোথায়; আর জিরার্ডের নৃতত্ত্ব আমাদের জানায়, সেই আবেগ কীভাবে সামাজিক সহিংসতায় রূপান্তরিত হয়। এই তিন স্তরের বিশ্লেষণ একত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, 'ডাইনীর বাঁশি'-র মতো গল্প কেবল একটি করুণ পারিবারিক আখ্যান নয়, বরং সামাজিক সহিংসতার একটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক দলিল; আর 'খড়গ' বা 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র মতো অতিপ্রাকৃত গল্প কেবল লোকবিশ্বাসের প্রতিফলন নয়, বরং অপরাধবোধের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাংস্কৃতিক রূপায়ণ।

এই দৃষ্টিভঙ্গি তারাশঙ্কর-চর্চার পূর্ববর্তী সকলধারা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভিন্ন। যেখানে অন্য ধারা তারাশঙ্করের চরিত্রদের সামষ্টিক-ঐতিহাসিক সংকটের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠ করে, যা জমিদারতন্ত্রের পতন, শ্রেণিসংঘাত, ঔপনিবেশিক ক্ষমতা নিয়ে। তবে এই প্রবন্ধের রসতাত্ত্বিক-মনোবিশ্লেষণাত্মক পাঠ চরিত্রদের ব্যক্তিগত, অভ্যন্তরীণ মনোজগতের ওপর কেন্দ্রীভূত। দুই দৃষ্টিভঙ্গিই বৈধ ও পরস্পর-পরিপূরক; কিন্তু 'ছলনাময়ী' ও 'রসকলি' সংকলনের ক্ষুদ্র-পরিসর, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক গল্পগুলির জন্য মনস্তাত্ত্বিক পাঠ অধিকতর উপযোগী প্রমাণিত হয়, কারণ এই গল্পগুলির নাটকীয় উত্তেজনা মূলত সামাজিক কাঠামোর সংঘাত নয়, বরং ব্যক্তিমনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত।

এই প্রবন্ধের তিনটি অনুসন্ধান ছিল, যার প্রথম প্রতিপাদ্য ছিল যে, তারাশঙ্করের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রাচ্য রসতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য মনোবিশ্লেষণ উভয় কাঠামোতেই সমান দক্ষতায় পাঠযোগ্য, যা 'সন্ধ্যামণি' গল্পের শোক-মনস্তত্ত্ব, 'ডাইনীর বাঁশি'-র স্কেপগোট-প্রক্রিয়া, 'খড়গ' ও 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র repetition compulsion, এবং নামগল্প 'ছলনাময়ী'-র id-superego সংঘাত; প্রতিটি বিশ্লেষণ এই প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করেছে। দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য ছিল যে, এই মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা মানব চরিত্রের বাইরেও বিস্তৃত; 'কালাপাহাড়' গল্পের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে তারাশঙ্কর একটি মহিষের অভ্যন্তরীণ শোক ও আসক্তিকেও মানবচরিত্রের সমান মনস্তাত্ত্বিক মর্যাদায় চিত্রিত করেছেন। তৃতীয় ও কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য ছিল যে এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা মৃত্তিকা-সংলগ্ন বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যেখানে স্বর্ণর সামাজিক বলিদান গ্রাম সমাজের মধ্যে,

কালাপাহাড়ের যন্ত্রণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, মঞ্জুরীর আত্মমর্যাদা বৈষ্ণব সমাজের প্রাঙ্গণে ঘটে; তারাশঙ্করের কোনো চরিত্রই বিমূর্ত মনস্তত্ত্বের নিরাসক্ত পরীক্ষাগারে বাস করে না।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ‘মৃত্তিকা ও মনস্তত্ত্ব’ - দুটি শব্দ তারাশঙ্করের সাহিত্য দর্শনের দুটি অবিচ্ছেদ্য অভিমুখকে নির্দেশ করে, যাদের মধ্যে কোনো স্তরবিন্যাস নেই। মাটি মনকে গড়ে তোলে, আবার মন মাটিকে অর্থবহ করে তোলে। *ছলনাময়ী* ও *রসকলি* গল্পগ্রন্থের রসতাত্ত্বিক ও মনোবিশ্লেষণাত্মক পাঠ প্রমাণ করে যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল গ্রামবাংলার সমাজতাত্ত্বিক দলিল-রচয়িতা নন; তিনি মানবমনের এবং প্রয়োজনে মানবেতর মনেরও, অন্ধকারতম ও কোমলতম কোণগুলিকে একই দক্ষতায় আলোকিত করতে সক্ষম এমন এক শিল্পী, যাঁর অন্তর্দৃষ্টি বহুক্ষেত্রে পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য মনোবিশ্লেষণ ও নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক আবিষ্কারকে ভাষাগতভাবে না হলেও অভিজ্ঞতাগতভাবে পূর্বাভাসিত করে।

এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত রসতত্ত্ব-মনোবিশ্লেষণ-জিরার্ডীয় নৃতত্ত্বের সংশ্লেষিত পাঠকাঠামো ভবিষ্যতে তারাশঙ্করের অন্যান্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য হতে পারে। বিশেষত তাঁর পরবর্তী পর্বের রচনায়, যেখানে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। এই মৃত্তিকালগ্ন মনস্তাত্ত্বিক পাঠকাঠামো এবং পূর্ববর্তী উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ সংলাপ স্থাপন করা সম্ভব, যা তারাশঙ্কর-চর্চাকে একটি সমৃদ্ধতর, আন্তঃবিষয়ক দিগন্তে উন্নীত করবে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, জগদীশ, (১৯৭৫), *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* ভূমিকাংশ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পৃ. ৪১

২. Freud, Sigmund, (1919) *The Uncanny* (Das Unheimliche). Trans. James Strachey, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Vol. XVII. London: Hogarth Press, P. 245

৩. Girard, René, (1977) *Violence and the Sacred*, Trans. Patrick Gregory. Baltimore: Johns Hopkins University Press, (originally La Violence et le sacré, 1972), P. 79-95

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৭৫), ‘সন্ধ্যামণি’, *ছলনাময়ী, তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পৃ. ২২৪

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৭৫), ‘ডাইনীর বাঁশী’, ছলনাময়ী, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পৃ. ২৩৫

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৭৫), ‘খড়্গ’, ছলনাময়ী, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পৃ. ২৮০

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৭৫), ‘আখড়াইয়ের দীঘি’, ছলনাময়ী, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯ পৃ. ২৯৪

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৭৫),’ছলনাময়ী’ (নামগল্প), ছলনাময়ী, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পৃ. ৩৩৬

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, ‘রসকলি’ (নামগল্প), *রসকলি,* তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ১২, পৃ. ৫১৭

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, ‘কালাপাহাড়’, *রসকলি,* তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ১২, পৃ. ৪০৬

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, ‘শ্মশান বৈরাগ্য’, *রসকলি,* তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ১২, পৃ. ৪৫৮

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, ‘অগ্রদানী’, *রসকলি,* তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ১২, পৃ. ৪৮৯

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, ‘ব্যাধি’, *রসকলি,* তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 97 - 106
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কলিকাতা ১২, পৃ. ৩১৪

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ১৩৬৫, 'মুসাফিরখানা', *রসকলি*, তারাশঙ্কর রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ১২, পৃ. ৪৪৪

১৬. Bharata Muni. Natyashastra. Trans. Manomohan Ghosh. Calcutta: Asiatic Society, 1950

১৭. Rupa Gosvami. Bhaktirasamritasindhu. On the classification of vatsalya as a distinct rasa within Vaishnava aesthetics.

১৮. আফরিন, সাদিয়া, 'ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনুয়া আচেবের ছোটগল্পের এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ', Trisangam International Refereed Journal (TIRJ), Vol. vi, Issue ii, April 2026, pp. 151–162